কবিতার বদলে কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অন্নদাস

ভাঙো হাঁটু, দাঁতের ভিতর ধরো ঘাস
অন্নদাস,
এই তোমার খুলেছে চেহারা।
কারা
ঢাক-পিটিয়ে ঢাক-পিটিয়ে ঢাক-পিটিয়ে জঙ্গলের ভূমি
কাঁপাচ্ছে দুপুরে, তুমি
জানো।

আসলে ব্যাপারটা খুবই চমৎকার কৌশলে সাজানো।
কাঁটা
দিয়ে কাঁটা তুলবার খেলাটা
কে না জানে?

হাতিও হাতিকে টেনে আনে।
অন্নদাস,
ভাঙো হাঁটু, দাঁতের ভিতরে ধরে ঘাস।

একদিন এইসব হবে, তাই

একদিন সমস্ত যোদ্ধা বিষণ্ণ হবার মন্ত্র শিখে যাবে।
একদিন সমস্ত বৃদ্ধ দুঃখহীন বলতে পারবে, যাই।
একদিন সমস্ত ধর্ম অর্থ পাবে ভিন্ন রকমের।
একদিন সমস্ত শিল্পী কল্পনার প্রতিমা বানাবে।
একদিন সমস্ত নারী চোখের ইঙ্গিতে বলবে, এসো।
একদিন সমস্ত ধর্মযাজকের উর্দি কেড়ে নিয়ে
নিষ্পাপ বালক বলবে, হাহা।
একদিন এইসব হবে বলেই এখনও
সূর্য ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, এবং কবিতা লেখা হয়।

কবি

কবি, তুমি গদ্যের সভায় যেতে চাও?
যাও।
পা যেন টলে না, চোখে সবকিছুকে-তুচ্ছ-করে-দেওয়া
কিছুটা ঔদাস্য যেন থাকে।

> যেন লোকে বলে,
> সভাস্থলে
> আসবার ছিল না কথা, তবুও সম্রাট এসেছেন।

ঘরবাড়ি ও অজস্র ঘটনা

> দৌড়তে দৌড়তে দিন যায়,
> অতর্কিতে রাত্রি নেমে আসে,
> তারপরে সে যেতে চায় না আর।
>
> কবে যেন সকালবেলায়
> দেখেছিলি কার নয়নে ভাসে
> উন্মীলিত পদ্মের বাহার।
>
> সে কি গতকল্যের, না গত-
> জন্মের স্মৃতির একটি কণা?
> প্রশ্ন করে বিষন্ন সানাই।

ঘোড়া

> “কাল থেকে ঠিক পালটে যাব
> দেখে রাখিস তোরা,”

বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়ল অশ্বমেধের ঘোড়া
পথের মধ্যিখানে।

ভেবেছিলুম, যে দিকে যাই, জ্বালতে-জ্বালতে যাব
শহর-গঞ্জ কারখানা-কল, কিন্তু এখন প্রাণে
অন্যরকম ভুজুং দিচ্ছে অন্যরকম হাওয়া।

"এই নে, তোকে দিলুম বাড়ি, নতুন খড়ে ছাওয়া,
দিলুম আগরতলার শীতলপাটি।
কৃষ্ণা গাভীর দুগ্ধ দিলুম, বড্ডরকম মিঠে,
এবং সোঁদরবনের মধু, চোদ্দ-আনা খাঁটি।"

শুনেই আমি চমকে উঠি, পথের শক্ত ইঁটে
লাথি কষাই, হাওয়ার মধ্যে কোড়া
ঘুরিয়ে বলি, "আয় রে আমার অশ্বমেধের ঘোড়া;
আয়, যে রকম কথা ছিল, তেমনি করে বাঁচি।"

তেমনি করে কেউ বাঁচে না, নেই-কুসুমের তোড়া
কেউ বাঁধে না, কোত্থেকে জল কোথায় চলে যাচ্ছে।
নজর করলে দেখতে পাবি, রক্ত শুষে খাচ্ছে
অশ্বমেধের ঘোড়ার পিঠে রাক্ষুসে এক মাছি।

জাহাজি কবিতা

মাঝে-মাঝে মনে হয়, রক্তের ভিতরে আর ঝাঁকি নেই।
তাই বলে কি বাকি নেই
কোনো কাজ?
সভাকক্ষে গিয়ে কি পরাস্ত কণ্ঠে বলব, "মহারাজ,
বিস্তর উদ্যম, ঘর্ম, এবং সময়
দিয়েছি আপনাকে, আর নয়,
এইবারে সম্যক্ ছুটি দিয়ে দিন?"

ময়দানের বিশাল মিটিং
ফুঁড়ে উর্দ্ধে উঠে যায় সুন্দর সুঠাম ছায়াতরু,
গাছতলায় চাঁদকপালি গোরু
ঘাস খায়। কিচিমিচি
তিনটে-চারটে-পাঁচটা-ছ'টা চড়ুইয়ের ঝগড়া চলে মিছিমিছি।
অশ্বত্থের জানালায়
আলো এসে ছায়াকে ডাক দিয়ে দূরে সরে যায়।
তা ছাড়া কোথাও কোনো ডাকাডাকি নেই।
রক্তের ভিতরে আর ঝাঁকি নেই।
কিংবা আছে। যে-লোকটা রাত্তিরে তারা গোনে,
তার দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে গোপনে-গোপনে
ধুলোর ভিতরে
হাটেমাঠে, গ্রীষ্মে ও বর্ষায়, খোড়োঘরে
যে-রকম।

একদিকে বিশ্রাম নিচ্ছি, সেরে উঠছে সমস্ত জখম,
অন্যদিকে

যা যা দেখছি, চিত্তে সবই রাখছি লিখে,
ডাক্তার সম্মত হেসে মাথা নাড়ছে,
সে জানে, বর্ষার জলে নদীর নাব্যতা বাড়ছে,
খলখল
হাততালি বাজিয়ে ছুটছে জল,
বিশ্রামের অবসরে তৈরী হচ্ছে কাজ।

মহারাজ,
জ্ঞাতার্থে জানাই, রক্তে ঝাঁকি মেরে আবার জাহাজ
জলে নামবে। আজ না হোক তো কাল
ডেকের উপরে তার উড়তে থাকবে অজস্র রুমাল,
ঘণ্টা বাজবে ঢং ঢং।

হাসপাতালে আজকে তার আমূল ফেরানো হচ্ছে রঙ।

বন্ধুর স্মরণে

ওকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে, ওকে আজ
শ্বেতচন্দনের ফোঁটা দাও,
ওকে পট্টবসনে সাজাও;
ওকে বলো, এইখানে সমাপ্ত ওর কাজ,
ও এখন যেতে পারে।

ও যাবে কোথায়, কার উদ্যানের ঝাড়ে
ওর জন্যে ফুটেছে গোলাপ?

এর মধ্যে উঠল কেন গোলাপের কথা?
ও খুব ভালই জানে, কারও
উদ্যানে গোলাপ নেই, আছে তার ধারণা কেবল;
আছে মাটি, আছে রৌদ্র, এবং আঁজলায় কিছু জল।
তা হলে ছলনা ছাড়ো,
ওকে যেতে দাও।

ও যাবে কোথায়? ও কি সত্যিই কোথাও
যেতে চায়?

হায়,
তুমিও জানো না কিছু? সর্প অভিমান
থেকে ও বিমুক্ত আজ, তাই বিশ্বজোড়া
সাম্রাজ্য এখন ওকে ডাকে।
ওই দ্যাখো, সূর্য ওরই প্রশস্তি রচনা করে রাখে,
সমুদ্রের তরঙ্গে পা ঠোকে ওর ঘোড়া।

বিরহ, এবং

জলের খানিক নীচে রয়েছে শৈবাল,
সামান্য ঝুঁকলেই দেখা যায়;
কিন্তু সে দেখে না, তার দৃষ্টিকে সে লাল
গোলাপের সন্ধানে পাঠায়।
আমি দেখি, উদয়াস্ত আমি দেখি তাকে,

বিরহ-ভাবনার মতো নিরন্তর দুলে যেতে থাকে
জলজ শৈবাল।

।।২।।

মর্মমূলে বিঁধে আছে পঞ্চমুখী তীর,
তার নাম ভালবাসা।
কেটেছে গোক্ষুরে যেন, নীল হয়ে গিয়েছে শরীর,
তার নাম ভালবাসা।
ঠাকুমা বলতেন, ওই সূর্যতাকে ছিঁড়ে
এনে যে লণ্ঠন জ্বালে দুঃখীর কুটিরে
তার নাম ভালবাসা।

মিছুটান

যে যায়, সে যায়
যে থাকে, সে টেনেবুনে পাঁচ-দশ বছর আরও থাকে।
সেও যেত, কিন্তু তার রয়েছে বেজায়
পিছুটান, কেউ-কেউ রহস্য করে যাবে
বলে মিছুটান।

সে বলে, "ও বড়বউ, শেষকালে যে দফতরে গর্দান
কাটা পড়বে, ভাজাভুজি-চচ্চরি যা হয়

তা-ই দিয়েই খেতে দাও, আটটা বাজে, কালকে হয়েছিল বড্ড দেরি, আজ যেন না হয়।”

কালকে সে সমস্ত রাস্তে ভয়ে-ভয়ে ছিল।

সে খুব দুঃখিত নয়, সে খুব সুখীও নয়। তার একদিকে বড়বউ, অন্যদিকে বড়বাবু। মধ্যিখানে ক্রমাগত দেরি করতে-করতে প্রাণ-ভ্রমরা আছে তার টিঁকে।
পাঁচ-দশ বছর আরও মাঝেমধ্যে বলবে সে, “ধেত্তেরি!”